তারিখ ... 27 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক
জনকণ্ঠ

পরীক্ষায় নকল বন্ধ করা

পরীক্ষায় একশ্রেণীর পরীক্ষার্থীর নকল করার প্রবণতা আমাদের দেশে একটি পুরনো সমস্যা। সব আমলেই কমবেশি নকল হয়ে আসছে। তবে এ কথা সত্য যে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে গেছে। নকল করে যেনতেনভাবে পাস করাই যেন অনেকের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'নকল প্রতিরোধের নামে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো' শিরোনামে রবিবার জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, নকল করার কারণ দূর না করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এই অমানবিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শিক্ষক সমাজ ও দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চলছে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা নকল সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের ওপর এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ওসমান ফারুক নকলমুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ১০০ ভাগ বেতন দেয়া এবং নকলপ্রবণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন কমানো হবে—এ মর্মে বক্তব্য পেশ করেছেন। শুক্রবার বিয়াম ভবনে নকল প্রতিরোধে মোটিভেশন শীর্ষক এক আলোচনাসভায় শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ শিক্ষামন্ত্রীর উক্ত বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নকল করে না, শিক্ষকরা পরীক্ষা দেন না। সেজন্য নকলের কথা বলে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কমবেশি করার প্রশ্নই আসে না। কাজী ফারুক বলেন, মন্ত্রণালয়-অধিদফতর ও বিভিন্ন প্রকল্পে শিক্ষার নামে কোটি কোটি টাকা অপচয় ও দুর্নীতির চিত্র তুলে না ধরে দাতাগোষ্ঠীর কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের সম্পর্কে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর পরিসংখ্যান দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণের অশুভ উদ্দেশ্যে একের পর এক কালাকানুন জারি করা হচ্ছে। ওই প্রতিবেদনে শিক্ষক সমাজের বরাত দিয়ে আরও অনেক কঠোর মন্তব্য করা হয়েছে। শিক্ষকরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, পড়াশোনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি না করে শিক্ষাবিদদের মর্যাদাহানিকর বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দেয়া হচ্ছে। তাঁরা অবিলম্বে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের শতকরা ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধিসহ ২১ দফা দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এই হলো শিক্ষদের বক্তব্যের সারমর্ম। তা ছাড়া বিভিন্ন সময় নকল ঠেকাতে গিয়ে শিক্ষকরা যে হেনস্থা হয়েছেন, সে কথাও তাঁরা বলেছেন।

তাহলে নকল বন্ধ করার পথ কি? একশ্রেণীর অভিভাবক, শিক্ষক এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কেউ কেউ নানাভাবে নকল প্রবণতায় ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করে থাকেন বলে পত্র-পত্রিকায় ইতোপূর্বে একাধিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এসএসসি, এইচএসসির মতো একাডেমিক পাবলিক পরীক্ষায় তো বটেই, চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় পর্যন্ত অসদুপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। শিক্ষক নিয়োগ এমনকি বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগেভাগেই ফাঁস হয়ে যাওয়ার মতো লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত আছে আমাদের সামনে। এককথায় নকল আমাদের দেশে একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এর কবল থেকে আমাদের ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজকে রক্ষা করতেই হবে। বিষয়টি জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যও বিপজ্জনক। সরকার দাবি করে যে, নকল প্রতিরোধকল্পে কর্তৃপক্ষ প্রতিকারমূলক কিছু ব্যবস্থা নেয়ায় গত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে কম নকল হয়েছে। এই দাবিটি একেবারে ভিত্তিহীন নয়। তা সত্ত্বেও গত বছর এসএসসি পরীক্ষার সার্বিক যে পরিস্থিতি দেখা গেছে, তা খুব একটা আশ্বস্ত হবার মতো ব্যাপার নয়। যেমন ২০০২ সালের নকল ধরা পড়ায় বহিষ্কৃত হয় সাড়ে ২৬ হাজার পরীক্ষার্থী। শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছেন প্রায় দেড় শ'। গত বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হয় ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী এবং শতাধিক শিক্ষক। নকল প্রতিরোধে কার্যকর যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে সবার আগে নকলপ্রবণতার উৎসমূল কোথায় তা নির্ণয় করা দরকার। আসল প্রতিকার প্রয়োজন সেখানেই। ক্লাসে সারা বছর ঠিকমতো লেখাপড়া হলে এবং যত্ন নিয়ে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য তৈরি করা হলে অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা এমনিতেই কমে যাবে। এ জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মমতো পাঠদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত তদারকি প্রয়োজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে এই গুরুদায়িত্বটি পালন করতে হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে যার যা দায়িত্ব তার তা পালন করা উচিত। তাহলেই সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব।

এটি একটি সামাজিক গুরুদায়িত্ব। এখানে একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনের দোষারোপ করা ঠিক নয়। সকলে মিলে উদারচিত্তে চেষ্টা করলে নকলপ্রবণতা একেবারে বন্ধ না হলেও নিম্নতম পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব। ইতোমধ্যে শিক্ষক সমাজের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়াগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মেনে নেয়া উচিত।